নেতাজী, হিন্দুত্ব ও আর এস এস

শতবর্ষে নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ

ভবেন্দু ভট্টাচার্য

মহাবৈভব দেশগৌরব মন্ত্রিত তব আহ্বান;
ছন্দিত চির সঙ্ঘ-জীবনে সূর্য সমান অম্লান।
নবভারতের প্রান্তে প্রান্তে
বাজে তোমার পাঞ্চজন্য —
জীবন - মরণ অর্পণ কর
মাতৃভূমির জন্য।

স্বদেশ সেনানী স্বয়ংসেবক সম্মুখে আগুয়ান,
মৃত্যুঞ্জয়ী নেতাজী সুভাষ জীবনের জয়গান।
আগে চল — আগে চল —
সময় সাগরে এসেছে জোয়ার
উদ্দাম উচ্ছল।
আগে চল — আগে চল —
আমরা রুখেছি হানাদার অরি
রুখেছি চক্রী ভারত-বৈরী
পথ নির্দেশে এখনো তৈরী
প্রাণময় চঞ্চল।
অমারাত্রির সজাগ প্রহরী জাগ্রত সপ্রাণ,
চলমান আজও নূতন কালের দুরন্ত অভিযান।।

জয়তু সুভাষ — নেতাজী সুভাষ
জয়তু সুভাষচন্দ্র,
তোমার ডঙ্কা শত্রু - শঙ্কা
তূর্যে মুখর মন্দ্র।
দিগন্তভেদী বন্ধুর পথ দুর্গম পথযাত্রী —
আলোক দিশার দুস্তর বাধা গহন গভীর রাত্রি।
তোমার মশাল তুলে ধরে চলে সত্যসেবক সঙ্ঘ;
দুর্বার গতি করিবে সকল বাধার প্রাচীর ভঙ্গ।
আগে চল — আগে চল—
ভারত আমার ভারত জননী
উচ্চ কণ্ঠে বল।
আগে চল — আগে চল —
নিশানা পড়ুক আঁধারেতে ঢাকা
গৈরিক ধ্বজ আলোর পতাকা
লক্ষ্যের পট্ অন্তরে আঁকা
হৃদয় দুয়ার খোলো।
জয়তু সুভাষ — ভারত - পথিক, দেশ-নিবেদিত প্রাণ,
স্বদেশ সেনানী স্বয়ংসেবক তব পথে চলমান।।

✳

নেতাজী ও জাতীয়তাবাদ

যদি প্রশ্ন করা যায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে আগামী ভারত কি কারণে মনে রাখবে? যদি প্রশ্ন করা যায়, ভারতের যুবসমাজ নেতাজীর কাছ থেকে কোন্ বিষয়ে সর্বোচ্চ প্রেরণা পেতে পারে? যদি প্রশ্ন করা যায়.নেতাজীর সারা জীবনের সমস্ত ভাবনা ও সমস্ত কাজের পিছনে মূলমন্ত্র কী? এই সব প্রশ্নগুলিরই একটাই উত্তর হবে, 'দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ। দেশের জন্য সর্বোচ্চ বলিদান। দেশ দেশ দেশ। আর কিছু নয়, শুধু দেশমাতৃকা। জীবন, যৌবন, ধন, মান, সুখী গৃহকোণ, পরিবাব, সব কিছু উৎসর্গ করে দেওয়া দেশ মাতৃকার চরণতলে।' এই উত্তর কেউ অস্বীকার করতে পারেন কি? সুভাষচন্দ্রের সারা জীবনের সাধনা ছিল দেশ না অন্য কিছু? তাঁর কথাতেই শোনা যাক। ১৯২৫ সালে ১৬-ই ডিসেম্বর মান্দালয় জেল থেকে নিজের মেজবৌদি শ্রীমতী বিভাবতী বসুকে তিনি লিখছেন, "আমরা ধর্মপুস্তকে প্রায়ই পড়ে থাকি যে দুঃখের মধ্যে সুখ আছে। এ কথাটা একশবার সত্যি। কর্মের মধ্যে যদি মানুষ কোন প্রকার সুখ না পেতো, তাহলে মানুষ কখনও অম্লান মনে কষ্ট সইতে পারত না। অবশ্য যে কষ্টটা মানুষ পরের জন্য ভোগ করে তার মধ্যে যতটা সুখ পায় বোধ হয় অন্য কোন কষ্টের মধ্যে ততটা সুখ পায় না। মা ছেলের জন্য, ভাই ভাইয়ের জন্য, বন্ধু বন্ধুর জন্য অথবা স্বদেশসেবী দেশের জন্য যে দুঃখ ভোগ করে, তার মধ্যে যদি আনন্দ না পেতো, তবে কি সে কষ্ট সহ্য করতে পারতো? ভক্ত যে বিরহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে থাকে একথা খুব ঠিক। কারণ এক বৎসর কাল দেশান্তরিত হয়ে আমি অনুভব করছি আজ আমার জন্মভূমি আমার নিকট কত প্রিয়, কত সুন্দর হয়ে উঠেছে। আজ মনে হচ্ছে জন্মভূমিকে এখন যত ভালবাসি, জীবনে এত ভালবাসি নাই। আর সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির জন্য যদি কষ্ট সইতে হয় — সে কি আনন্দের বিষয় নয়? আজ আমি বাইরে দেশ ছাড়া — কিন্তু অন্তরের মধ্যে, কল্পনার মধ্যে দেশকে পেয়ে থাকি। আর সে পাওয়ার মধ্যে কি কম আনন্দ?"

সুতরাং, অন্তরে, বাইরে, স্বপ্নে, জাগরণে, কর্মে, কল্পনায় সবকিছুতে দেশই ছিল যাঁর সাধনার ধন, সেই সুভাষচন্দ্রের সেই দেশব্রতের নির্ভেজাল অনুসরণ করে চলেছে আজ ভারতবর্ষের কোন্ সংগঠন ? একমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। আর এস এসের লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবক ভারতের ৩৬ হাজার শাখায় প্রতিদিন বুকে হাত দিয়ে সংকল্প বাক্য উচ্চারণ করছে 'হে স্নেহময়ী মাতৃভূমি, তোমার জন্য আমার এই শরীর পতিত হোক। তোমাকে বার বার প্রণাম করি।' (নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে, ... পতত্বেষ কায়ো নমস্তে নমস্তে।) তারা প্রতিদিন একটাই উদ্‌ঘোষ করছে 'ভারত মাতা কি জয়'। ভারতের সমস্ত ভাষাতে স্বয়ংসেবকেরা শত শত গানের মাধ্যমে একজনেরই বন্দনাগীত গাইছে। তা হল আমাদের দেশমাতৃকা, আমাদের ভারতমাতা।

তাই স্বয়ংসেবকদের কাছে অতি প্রিয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র। নেতাজীর জীবনেই তো তারা দেখেছে, কিভাবে স্বামীজীর সেই বাণী, 'দেশজননী ভারতমাতা তোমাদের একমাত্র আরাধ্যা দেবী হোন।' এই বাণীকে নিজের জীবনে সাকার করেছেন। সেই নেতাজীর জন্মশতবর্ষ পালন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ যে বেশ বড় আকারে করবে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু যেটা স্বাভাবিক নয়, তা হল কম্যুনিষ্টদের নেতাজী জন্মশতবর্ষ পালন। না, তারা যে এতদিন নেতাজীকে যা নয় তাই বলে গালাগালি করেছিল, সেজন্য বলছি না। তারা যে নেতাজীকে তোজোর কুকুর বলেছিল, জাপানি কুত্তা বলেছিল, কুইসলিং (বিশ্বাসঘাতক) বলেছিল, নাৎসী বলেছিল, নেতাজী তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে দেশে ঢুকলে উচিত জবাব দেওয়ার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিল, নেতাজীকে তোজোর গাধা এঁকে তাদের মুখপত্র **People's War** -এ ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছিল, সেইজন্য তাদের নেতাজী জন্মশতবর্ষ পালন করার অধিকার নেই সেকথা বলছি না। কারণ, এসবের জন্য তারা ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। নিজেদের ফেলা থুতু তার নিজেরাই চেটেছে। কিন্তু তারা তাদের ৭২ বছরের ইতিহাসে একদিনের জন্যও দেশকে মা বলে স্বীকার করেনি। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের দোহাই দিয়ে দেশকে মা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। একজন কম্যুনিষ্টও এখনও পর্যন্ত 'বন্দে মাতরম্' বা 'ভারতমাতা কি জয়' বা 'জয় হিন্দ' উচ্চারণ করেনি। তারা রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, কিউবার নামে কত জয়ধ্বনি দিয়েছে। কিন্তু একবারও ভারতবর্ষের নামে জয়ধ্বনি দেয়নি। আর

তারা আজকে ঘটা করে নেতাজী জন্মশতবর্ষ পালন করছে। কি অধিকার আছে তাদের সুভাষচন্দ্রকে স্মরণ করার, যে সুভাষচন্দ্রের 'আমার জন্মভূমি আমার নিকট কত প্রিয় কত সুন্দর হয়ে উঠেছে', যে সুভাষচন্দ্রের 'জন্মভূমিকে এখন যত ভালবাসি জীবনে এত ভালবাসি নাই'।

সুতরাং কম্যুনিষ্টরা নেতাজী সম্বন্ধে অকথ্য গালিগালাজ করা সম্বন্ধে আজ ক্ষমা চেয়ে নিলেও, দেশকে এখনও মা বলে না। তাই নেতাজী জন্মশতবর্ষ পালন করার অধিকার তাদের আছে কিনা- এ প্রশ্নের উত্তর কম্যুনিষ্টদের কাছে সাধারণ মানুষ চাইবে।

আর আছে কংগ্রেস। তারাও নেতাজী জন্মশতবর্ষ পালনের উদ্যোগ নিয়েছে। অথচ এই কংগ্রেসই নেতাজীকে দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। সেই ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন যে জওহরলাল নেহরু, সেই নেহরু পরিবাবরেই এখনও পর্যন্ত মৃতপ্রায় কংগ্রেসের কাছে সঞ্জীবনী সুধা বলে মনে করে সমস্ত কংগ্রেস কর্মীরা। নেতাজী যখন তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের সঙ্গে বর্মা ও মণিপুরের দুর্গম জঙ্গলে বুকে হেঁটে লড়াই করছেন তখন জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করছেন, 'সুভাষচন্দ্র ভারতে ঢুকলে আমিই সর্বপ্রথমে খোলা তলোয়ার হাতে তার মোকাবিলা করব'। সেই নেহরুই এখনও কংগ্রেসের আরাধ্য দেবতা। সেই নেহরু কন্যা ইন্দিরা এখনও কংগ্রেস কর্মীদের কাছে ভারতমাতা। সেই নেহরুর বিদেশিনী নাতবৌ এখনও পর্যন্ত কংগ্রেস কর্মীদের কাছে একমাত্র আশার স্থল। নেতাজী বিরোধী সেই নেহরু পরিবারেরই তিন পুরুষের ছবি এখনও পর্যন্ত এই বাংলায়ও কংগ্রেসের প্রত্যেকটি মঞ্চ আলোকিত করে রাখে। এখনও পর্যন্ত কংগ্রেস সুভাষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার ও নেহরুর নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরোধিতা করার অপকর্মের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। সেই কংগ্রসের নেতাজী জন্মশতবর্ষ পালনের কোনো অধিকার আছে কি?

না, নেই, এই কম্যুনিস্ট ও কংগ্রেস উভয়েরই নেই। তাও তারা করছে। কারণ, নেতাজী যে জনপ্রিয়। সেই জনপ্রিয়তার কিছু অংশ তারা নিজেদের পকেটে ভরতে চায়। আর তাদের নেতারা চায় নেতাজীর জনপ্রিয়তার ছটায় নিজেদেরকে আলোকিত করতে । অর্থাৎ নিজেদের নাম প্রচার করতে।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ নেতাজী জন্মশতবর্ষ পালনের মাধ্যমে তার কোন নেতার নাম প্রচার করতে চায় না। সংঘ চায় নেতাজীর আদর্শ প্রচার করতে। নেতাজীর দেশ ব্রতের আদর্শকে তরুণ কিশোরদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। কারণ, সংঘই তো নেতাজীর দেশব্রতের একমাত্র উত্তরসাধক। সংঘই তো একমাত্র সংগঠন যা নেতাজীর মতই জন্মভূমিকে মনে করে স্বর্গাদপি গরীয়সী। নেতাজীর প্রেরণার উৎস ছিল স্বামীজী। আর সংঘের প্রেরণার উৎস স্বামীজী ও নেতাজী। তাই সংঘের একাত্মতা স্তোত্রে স্বামীজী ও নেতাজীর নাম আছে ভারতের হাজার হাজার বছরের মহাপুরুষদের সঙ্গে সমান মর্যাদায়। সংঘের শাখায় শাখায় বালক কিশোরদের সামনে বলা হয় সুভাষচন্দ্রের দেশের জন্য ত্যাগের কাহিনী, বীরত্বের কাহিনী। বলা হয় সুভাষচন্দ্রের আই. সি. এস পরীক্ষায় সাফল্যের পরেও সেই লোভনীয় চাকরি ত্যাগের গল্প। বলা হয় প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক ওটেন সাহেব কর্তৃক ভারতের সম্বন্ধে কটূক্তির বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের সাহসী প্রতিবাদের কাহিনী ও তার জন্য ক্ষমা না চেয়ে কলেজ থেকে বিতাড়নের কাহিনী। শাখায় শাখায় গল্প বলা হয়, সেই দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের ঘনঘোর সময়ে রাসবিহারী বসুর আহ্বানে সাড়া দিতে জীবনের সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে সাবমেরিনে করে সুভাষচন্দ্রের জার্মানি থেকে জাপান যাওয়ার দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর কাহিনী। বলা হয় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীরত্বের কাহিনী। নেতাজীর জীবন থেকে ছোট ছোট স্বয়ংসেবকরা শেখে কি করে দেশের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়, সব কষ্ট সহ্য করা যায়। নেতাজী জন্মশতবর্ষে সংঘ নেতাজীর সেই আদর্শকেই আরও বেশী ছড়িয়ে দিতে চায়। খবরের কাগজের পাতায় অথবা টিভি-র পর্দায় নয়, স্বয়ংসেবকদের মনে।

সুভাষচন্দ্র ছাত্রজীবনেই জনসেবার কাজ শুরু করেছিলেন। কটক থেকে তাঁর বন্ধুদের নিয়ে গিয়ে গ্রামে কলেরা রোগীদের সেবা করেছেন। সে সময়ের সেই কালান্তক রোগের সামনে দাঁড়িয়েও জীবনের পরোয়া করেননি। আর সারা জীবন তো সুভাষচন্দ্র দেশ সেবা করে গেছেন। আজ তাঁরই উত্তরসাধক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ সারা দেশে ২০ হাজার সেবা কেন্দ্র চালাচ্ছে। অন্ধ্রের ঝঞ্ঝা হোক, অথবা গুজরাটের মোরভির তুফান, প্রথম এগিয়ে গেছে সংঘের স্বয়ংসেবকেরা খাকী হাফপ্যান্ট পরে । না, সংঘের নাম জাহির করার জন্য নয়। হাফপ্যান্ট পরে ত্রাণকার্যে সুবিধা হয় বলে। মহারাষ্ট্রে লাতুরের ভূমিকম্পে

অথবা হরিয়ানার চরখী-দাদরিতে ভেঙে পড়া বিমানের যাত্রীদের বাঁচাতে সবার আগে ছুটে গেছে স্বয়ংসেবকেরা । হিন্দু মুসলমান সকলকে একসঙ্গে উদ্ধার করেছে। কারণ তাদের কাছে যে 'ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ'।

নেতাজীর স্বপ্ন ছিল অনুশাসনবদ্ধ জাতি গঠনের। আজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘই যে এক দৃঢ় অনুশাসনবদ্ধ বিশাল দেশকর্মী বাহিনী তৈরী করতে পেরেছে, একথা আজ সংঘের শত্রুরাও স্বীকার করে। সংঘ এই কাজ করতে সফল হয়েছে প্রচারের দ্বারা নয়, তার প্রতিদিনের শাখায় শাখায় অনুশাসনের চর্চার দ্বারা।

নেতাজী ও হিন্দুত্ব

উপরের শীর্ষকটি কি খুবই অদ্ভুত লাগছে ? নেতাজী আবার কবে হিন্দু হিন্দু করেছেন? ধর্মকে নিয়ে আবার তাঁর কোন মাথা ব্যথা ছিল নাকি? ধর্মনিরপেক্ষতার এই রমরমা যুগে, যখন সবাই নিজের ধর্মনিরপেক্ষতা ঢাক ঢোল পিটিয়ে জাহির করতে ব্যগ্র, তখন আবার নেতাজীকে হিন্দু সাজানোর চেষ্টা কেন? কম্যুনিষ্টরা তো গোবর খাওয়ার মত করে প্রায়শ্চিত্ত করে নেতাজীকে হজম করার চেষ্টা করছে! এখন আবার যদি নেতাজীও হিন্দু হয়ে যান, তাহলে সে বেচারারা যায় কোথায়? একে তো বিবেকানন্দ তাদের গলায় আটকে গিয়েছে। জনসাধারণের উপর বিবেকানন্দের প্রভাব দেখে তারা বিবেকানন্দকে ওগরাতেও পারছে না। আবার হিন্দু ধর্ম নিয়ে বিবেকানন্দের বাড়াবাড়ির জন্য তাঁকে গিলতেও পারছে না। এদিক থেকে অন্ততঃ নেতাজীকে নিয়ে কিছুটা বাঁচোয়া। কারণ সেকুলারিজমের মহান প্রতিমূর্তি করে নেতাজীকে দেখাতে তো কোন অসুবিধা নেই!

আছে, একটু অসুবিধা আছে। অসুবিধাটা হল শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী। এই রচনাবলীতে সুভাষচন্দ্রের এমন সব কথা, লেখা, চিঠি প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলো সেকুলারিজমের পক্ষে একটু অসুবিধাজনক হয়ে যাবে। কারণ, বর্মার মান্দালয় জেলে থাকাকালীন বর্মা সরকারের (বৃটিশ অধীন) চিফ্ সেক্রেটারিকে সুভাষচন্দ্র লিখছেন, 'ভারতের ইতিহাসের পাতাগুলি সেই সব শহীদদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পূর্ণ, যাঁরা ধর্মবিশ্বাসকে অক্ষুন্ন রাখতে স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করেছেন। ভারতকে অমর রাখার জন্য তাঁর প্রাণত্যাগ করেছেন। আমাদের দারিদ্র্য ও অধোগতিকে উপেক্ষা করে ভারত আজও বেঁচে আছে। ভারত বেঁচে আছে কারণ তার আত্মা অবিনশ্বর — তার আত্মা অমর– কারণ, তার ধর্মবিশ্বাস আছে।" সুভাষচন্দ্রের এই উক্তিটি কোন আগা গোড়া ছাঁটা জোড়া তালি লাগানো উদ্ধৃতি — এরকম অভিযোগ নিশ্চয় উঠবে। সেইজন্য সুভাষচন্দ্রের সেই চিঠিটি একটু বড় করেই উদ্ধৃত করা যাক। মান্দালয়

জেলের সুপারিনটেনডেন্টের মাধ্যমে বর্মার ইংরাজ চিফ সেক্রেটারির উদ্দেশ্যে ১৯২৬ সালের ১৬-ই ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র লিখছেন —

" প্রিয় মহাশয়,

১৯২৬ সালের ১৬ জানুয়ারী এবং ২ ফেব্রুয়ারী আমাদের দাবীদাওয়া সংক্রান্ত যে দুটি পত্র দিয়েছিলাম সেগুলির কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাইনি, এটি দুঃখজনক ঘটনা। গত বছরের দুর্গাপূজা সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠেছিল সেটিরও সন্তোষজনক সমাধান হয়নি, অথচ ইতিমধ্যে ছ-মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। ....

ধর্মীয় ব্যাপারে আমাদের দাবী না মেনে আপনার সরকার ভারতীয়দের ধর্ম-প্রবণতা এবং তাঁদের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস সম্পর্কে দুঃখজনক অজ্ঞতা প্রদর্শন করেছে। আমরা যারা প্রাচ্যদেশীয়, আমাদের কাছে ধর্ম নিছক সামাজিক সম্মিলন, বুদ্ধিবিলাস বা ছুটির দিনের উৎসব নয়। এটি সপ্রাণ। ধর্ম আমাদের দৈনিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, ধর্ম আমাদের সমগ্র জাতীয় ও ব্যক্তিসত্তায় পরিব্যাপ্ত। ভাল-মন্দ যাই হোক না কেন, আমরা জাগতিক বস্তুর তুলনায় আধ্যাত্মিক বিষয়ের দিকে বেশি নজর দিই। এর ভিত্তিতেই আমাদের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা প্রজার জাত, এবং বহুদিক থেকে আমরা হয়ত ক্রীতদাসের মতো, কিন্তু ব্রিটিশ শক্তিকেও ভারতের প্রিয় মূল্যবোধগুলির প্রতি সম্মান জানাতে হবে। ভারতের ইতিহাসের পাতাগুলি সেই সব শহীদদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পূর্ণ, যাঁরা ধর্মবিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করেছেন। ভারতকে অমর রাখার জন্যে তাঁরা প্রাণত্যাগ করেছেন। আমাদের দারিদ্র্য ও অধোগতিকে উপেক্ষা করে ভারত আজও বেঁচে আছে। ভারত বেঁচে আছে কারণ তার আত্মা অবিনশ্বর — তার আত্মা অমর — কারণ, তার ধর্মবিশ্বাস আছে। আমরা অনেককিছু হারিয়েছি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে আর কিছু নেই। অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা এখন অতীতকালের বিষয়। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নিয়মিতভাবে হস্তক্ষেপ চলেছে ধীরগতিতে। কিন্তু এখনও আমাদের ধর্মবিশ্বাস অটুট। আমরা আমাদের মহান পূর্বপুরুষদের আদর্শে ঈশ্বরোপাসনা করতে চাই, পশ্চিমের ধর্মজগতের আওতায় যাওয়ার বদলে আমরা স্বধর্মে নিষ্ঠ থেকে আত্মবিসর্জন করতে প্রস্তুত।

আপনাদের সরকার আমাদের ধর্মীয় অধিকারে অবাঞ্ছিতভাবে হস্তক্ষেপ

করছে। মহারাণীর ঘোষণায় এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, ভারতের জনসাধারণ তাদের ধর্মবিশ্বাস অক্ষুন্ন রেখে ঈশ্বরোপাসনা করতে পারবে, কিন্তু আপনাদের নীতি এই ঘোষণার বিরোধিতা করছে। উপরন্তু, আমাদের মতে, এর ফলে ঈশ্বরের বিধানকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে — এটি অনেক বড় ব্যাপার। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সামান্য কয়েকজন খ্রীস্টান অপরাধীর ধর্মানুষ্ঠান পালনের জন্য বছরে ১২০০ টাকা দেওয়া হয় কিন্তু উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতিবান হিন্দু রাজবন্দীদের ধর্মানুষ্ঠান পালনের জন্য একটা পয়সাও দেওয়া হয় না। মহাশয়, এর ফলে কি সুবিচার এবং সদাচারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হচ্ছে না? **একজন ইউরোপীয় খ্রীস্টানের কাছে হিন্দুমাত্রই হিদেন হতে পারে এবং তার ধর্ম কুসংস্কারের বেশি মর্যাদা পায় না।** তাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সেক্ষেত্রে হয়ত নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু আমাদের ধর্ম শুধুমাত্র পরধর্মসহিষ্ণুই নয়, প্রতিটি ধর্মকেই মর্যাদার আসন দেয়, এবং বিশ্বাস করে কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অর্থই হল ঈশ্বরের বিধানকে অস্বীকার করা। . . . .

পশ্চিমের জড়বুদ্ধিসম্পন্ন সঙ্ঘ আজ ঠিক দুঃস্বপ্নের মতো ভারতের বুকের ওপর চেপে বসেছে। পলাশি, আসে, ল্যাঙ্কাশায়ার, লিড্স এবং বেন্থম ও জে. এস. মিল আমাদের সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্য থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে সর্বতোভাবে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। অতীতের ধ্বংসাবশেষ থেকে ভারত আবার ফোনিক্স পাখির মতো দ্বিতীয় জন্ম পরিগ্রহ করে বিশ্বের মুক্ত জাতিগুলির মধ্যে আবার স্থান পেতে চায়। কারণ — সে তার বাণী, মানবাত্মার বাণী প্রচার করে বিশ্বে তার ভূমিকা পালন করতে ইচ্ছুক। ভারত আজও বেঁচে আছে, কারণ তার সদিচ্ছা পূরণ হয়নি এখনও। শুধুমাত্র এই কারণেই সে সময়ের আঘাত সহ্য করে চলেছে। কত সভ্যতার উত্থান ও পতন হয়েছে, কত সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার পরে মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়; ব্যাবিলন ও নিনেভা, কার্থেজ ও গ্রীস ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি আজ যেমন সৃষ্টিক্ষম, কয়েক সহস্র বছর আগেও ঠিক সেইরকম ছিল। অথচ সে আমলে আধুনিক বিশ্বের অগ্রগণ্য কয়েকটি জাতি তখন প্রায় বর্বর ছিল। মহাশয়, আপনি কি মনে করেন — যে জাতির সমগ্র ইতিহাস সংগ্রামের কাহিনীতে পরিপূর্ণ সেই জাতি তাদের ধর্মীয় অধিকারে কাউকে অবাঞ্ছিত

হস্তক্ষেপ করতে দেবে? আমরা এই আশায় থাকি যে, ১৮৫৭ সালের যুদ্ধ এবং সাম্প্রতিককালের আকালি ও তারকেশ্বর আন্দোলনগুলির শিক্ষার কথা সরকার এখনও ভুলে যায়নি।"

[সূত্র ঃ *সমগ্র রচনাবলী (আনন্দ পাবলিশার্স) তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৮৯-৯১*]

আবার জেলের মধ্যে দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, দোল পূর্ণিমা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার জন্য সংগ্রাম করছেন সুভাষচন্দ্র। ২-রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ তারিখে তিনি অন্যদের সঙ্গে চিফ সেক্রেটারিকে লিখছেন,

" প্রিয় মহাশয়,

আমাদের দাবীদাওয়ার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সরস্বতী পূজার খরচ সম্পর্কে ১৬ জানুয়ারী, ১৯২৬-এ প্রেরিত পত্রটির কোনো জবাব এখনও আমরা পাইনি।

আমরা ইন্‌স্‌পেকটর জেনারেল অব প্রিজন্‌স্‌কে অনেক আগেই জানিয়েছিলাম যে, তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান (যেমন — সরস্বতী পূজা, হোলি ও দোলপূর্ণিমা উৎসব এবং দুর্গাপূজা) আমরা এখানে পালন করতে চাই। এই প্রসঙ্গে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, এই উৎসবাদির খরচপত্র যেন সরকার বহন করে। সরস্বতী পূজানুষ্ঠান পালিত হয়েছে প্রায় একপক্ষকাল আগে, ওই বাবদ খরচ হয়েছে ৭৬ টাকা ৯ আনা। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারী এবং পরবর্তী দু-দিন হোলি উৎসব সম্পন্ন হবে, এই উৎসব বাবদ খরচ সরস্বতী পূজার চাইতে সামান্য কিছু বেশি, কিন্তু ওই অর্থের পরিমাণ কোনো মতেই ১০০ টাকার বেশি হবে না। সরস্বতী পূজা এবং দোল-উৎসব বাবদ খরচের টাকা আমাদের দেবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।

এখানে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ওই জেলে খ্রীস্টান কয়েদীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য বছরে ১২০০ টাকা দেওয়া হয় । বাংলার জেলকয়েদী এবং রাজবন্দীদের সরকারী খরচে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ দেওয়া হয় — আমরা এ-তথ্যও আপনাদের জানিয়েছি। বর্মার জেলে বন্দীদের সরকারি খরচে কী-কী সুবিধে দেওয়া উচিত — সে সম্পর্কে আপনি এবার সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন আশা করি।"

[*সমগ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৮৬,৮৭*]

সুভাষচন্দ্রের জীবন গঠনে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের কি প্রভাব ছিল তাও

তাঁর নিজের লেখা থেকেই দেখা যাক। সুভাষচন্দ্রের অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থটির নাম 'ভারত পথিক'। তাতে তিনি লিখছেন —

''আমার জীবনে যখন বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটে তখন সবে পনেরয় পড়েছি। তারপর আমার মধ্যে শুরু হল এক বিপ্লব এবং সমস্ত কিছু ওলট পালট হয়ে গেল। তাঁর শিক্ষার পূর্ণ তাৎপর্য অথবা তাঁর ব্যক্তিত্বের বিরাটত্ব সম্যক উপলব্ধি অবশ্যই তখনও করতে পারিনি। তবু আমার মনে শুরু থেকেই এমন দাগ পড়েছিল, যা মুছবার নয়। যুগপৎ তাঁর ছবি আর শিক্ষা থেকে বিবেকানন্দকে এক পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব বলেই আমার বোধ হয়েছিল। এমন অনেক প্রশ্ন আমার মনকে নাড়া দিত যা খুব স্পষ্ট ছিল না এবং যেগুলি সম্বন্ধে পরে আমি চিন্তা করতাম, তাঁর মধ্যে সেগুলির সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পেতাম। প্রধান-শিক্ষকের ব্যক্তিত্বকে আর যথেষ্ট বড় বলে মনে হত না, যাতে তাঁকে আমার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। আগে ভাবতাম তাঁর মতই দর্শন নিয়ে পড়াশুনা করব এবং তাঁকে অনুকরণ করব। এখন বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথের কথা ভাবতে লাগলাম।

বিবেকানন্দ থেকে ক্রমে ক্রমে তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিয়েছেন, চিঠিপত্র লিখেছেন, এবং বহু পুস্তক প্রকাশ করেছেন যেগুলি সাধারণ মানুষের কাছে দুর্লভ নয়। কিন্তু রামকৃষ্ণ প্রায় একেবারে নিরক্ষর ছিলেন বলে তেমন কিছু করেন নি। তিনি নিজের মত চলেছেন আর তাঁর জীবন ব্যাখ্যা করা ছিল অন্যের কাজ। তথাপি, তাঁর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে যে সমস্ত শিক্ষা লাভ করা গেছে তার মূলকথা সম্বন্ধে তাঁর শিষ্যরা বহু পুস্তক বা দিনপঞ্জী প্রকাশ করেছেন। এই সব বই-এর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপাদান হল সাধারণভাবে চরিত্র-গঠন ও বিশেষ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে তাঁর বাস্তব নির্দেশ। তিনি অবিরতই এ কথা বলতেন যে, ত্যাগের দ্বারাই শুধু সিদ্ধিলাভ সম্ভব — সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করতে না পারলে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায় না। তাঁর শিক্ষার মধ্যে নতুনত্ব কিছু ছিল না, ভারতীয় সভ্যতার মতই তা প্রাচীন। হাজার হাজার বছর আগে উপনিষদ বলেছে যে, পার্থিব আকাঙ্খাসমূহকে পরিত্যাগ করতে পারলে তবেই অবিনশ্বর জীবন লাভ করা যায়। তবুও, রামকৃষ্ণের উপদেশের সার্থকতা ছিল এই যে, তিনি যে কথা বলতেন, সেইভাবেই চলতেন এবং তাঁর শিষ্যদের

মতানুসারে, আধ্যাত্মিক দিক থেকে তাঁর চরমোন্নতি ঘটেছিল।

রামকৃষ্ণের উপদেশগুলির মূলকথা ছিল — কাম ও কাঞ্চন ত্যাগ। তিনি মনে করতেন, আধ্যাত্মিক জীবনে কোন মানুষের যোগ্যতা বিচার করতে হলে, এই দ্বিবিধ ত্যাগের মাপকাঠিতেই তা বিচার্য। কামকে একেবারে জয় করার অর্থ যৌন-প্রবৃত্তিকে মহৎ-প্ররণায় উদ্বুদ্ধ করা, যার দ্বারা যে কোন পুরুষ প্রত্যেক নারীকেই মাতৃবৎ দেখতে পারে।

শীঘ্রই আমার এক বন্ধুগোষ্ঠী (আমার আত্মীয় এস. সি. এম ছাড়াও) গড়ে উঠল, যারা রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। স্কুলে ও স্কুলের বাইরে যখনই কোন সুযোগ পেতাম এ প্রসঙ্গ ছাড়া আমরা আর কিছু নিয়ে আলোচনা করতাম না। ক্রমে ক্রমে আমরা হেঁটে অনেকদূর চলে যেতাম, কি কোথাও বেড়াতে যেতাম যার ফলে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ ও আলোচনার অনেক বেশী ভাল সুযোগ পাওয়া যেত। আমাদের সংখ্যা বাড়তে থাকল, এবং এক অল্পবয়স্ক ছাত্রকে আমাদের মধ্যে সাদরে টেনে নিয়েছিলাম, যে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন ছিল এবং ভক্তিগীতি গভীর আবেগের সঙ্গে গাইতে পারত।"

"দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তাঁর রচনাগুলি মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগলাম। কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত তাঁর পত্রাবলী ও বক্তৃতাগুচ্ছ — স্বদেশবাসীকে প্রদত্ত বাস্তব উপদেশে পরিপূর্ণ — আমাকে সর্বাপেক্ষা অনুপ্রাণিত করেছিল। পড়বার ফলে তাঁর শিক্ষার মূলকথা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হল। 'আত্মানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' — তোমার নিজ মুক্তি ও মানবসেবা — এই হবে জীবনের লক্ষ্য। মধ্যযুগের স্বার্থবাদী monasticism বা বেন্থাম ও মিলের modern utilitarianism কোনটাই সম্পূর্ণ আদর্শ হতে পারে না। মানবসেবার মধ্যে স্বদেশ সেবাও অবশ্য স্বীকৃত হয়েছিল — কেন না তাঁর জীবন-চরিত লেখিকা ও প্রধানা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন — 'তাঁর আরাধ্যা দেবী ছিল তাঁর মাতৃভূমি। মাতৃভূমির এমন কোন দুঃখ ছিল না যা তাঁর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত না।' স্বামীজী নিজেও তাঁর এক আবেগ পূর্ণ বক্তৃতায় বলেছেন, 'উচ্চকণ্ঠে বল ভাই — দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"

[*সমগ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২০,২১*]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সুভাষচন্দ্র তাঁর কৈশোরাবস্থায় শুধু তাঁর চরিত্রগঠন

নয়, দেশপ্রেমের দীক্ষাও পেয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। শুধু বিবেকানন্দই নন, অরবিন্দের কাছ থেকেও সুভাষ আধ্যাত্মিক প্রেরণা পেয়েছেন। বিলাতে আই সি এস পাশ করার পর তিনি চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের মেজদা শরৎচন্দ্র বসুকে যে চিঠি লিখছেন, তাতে অত্যন্ত স্পষ্ট যে তিনি একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ছিলেন, জড়বাদী নাস্তিক ছিলেন না। তিনি চাকরি ছাড়তে মেজদার সম্মতি চেয়ে লিখছেন— "অরবিন্দ ঘোষের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমার দৃষ্টিপথে বিশালাকারে প্রতিভাত হয়। সেই দৃষ্টান্ত থেকে আমি অনুভব করি যে তাঁর মত আমিও ত্যাগ করতে প্রস্তুত। . . . . . অরবিন্দ ঘোষ আমার আধ্যাত্মিক গুরু। তাঁর কাছে এবং তাঁর উদ্দেশ্যের কাছে আমি আমার জীবন ও সত্তা সমর্পন করেছি। আমার সিদ্ধান্ত নিশ্চিত এবং অপরিবর্তনীয়, কিন্তু আমার ভবিষ্যত বর্তমানে আপনার হাতে"।

[*সমগ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১২০,১২১*]

কিন্তু বড় হয়েও কি সুভাষচন্দ্র মনে করতেন যে চরিত্র গঠনে ধর্মের কোন ভূমিকা আছে? মান্দালয় জেল থেকে জনৈক যুবক হরিচরণ বাগচীকে তিনি চিঠিতে লিখছেন, —

"নিয়মিত ব্যায়াম করিলে শরীরের যেরূপ উন্নতি হয় — তেমনি নিয়মিত সাধনা করিলেও সদ্বৃত্তির অনুশীলন ও রিপুর ধ্বংস হইয়া থাকে। সাধনার উদ্দেশ্য দুইটি ঃ— (১) রিপুর ধ্বংস, প্রধানতঃ কাম, ভয় ও স্বার্থপরতা জয় করা, (২) ভালবাসা, ভক্তি, ত্যাগ বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধন করা।

কামজয়ের প্রধান উপায় সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে মাতৃরূপ দেখা ও মাতৃভাব আরোপ করা এবং স্ত্রী-মূর্তিতে (যেমন দুর্গা, কালী) ভগবানের চিন্তা করা। স্ত্রী-মূর্তিতে ভগবানকে দেখিতে শিখে সে অবস্থায় পৌঁছিলে মানুষ নিষ্কাম হইয়া যায়। এই জন্য মহাশক্তিকে রূপ দিতে গিয়া আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্ত্রী-মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন : ব্যবহারিক জীবনে সকল স্ত্রীলোককে "মা" বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে মন ক্রমশঃ পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া যায়।

ভক্তি প্রেমের দ্বারা মানুষ নিঃস্বার্থ হইয়া পড়ে। মানবের মনে যখনই কোন ব্যক্তি বা আদর্শের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি বাড়ে তখন ঠিক সেই অনুপাতে স্বার্থপরতা কমিয়া যায়। মানুষ চেষ্টার দ্বারা ভক্তি ও ভালবাসা বাড়াইতে পারে এবং তার ফলে স্বার্থবরতাও কমাইতে পারে। ভাল বাসিতে বাসিতে মনটা

ক্রমশঃ সকল সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইয়া বিশ্বের মধ্যে লীন হইতে পারে। তাই ভালবাসা, ভক্তি বা শ্রদ্ধার যে-কোন বস্তু বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তা করার দরকার। মানুষ যাহা চিন্তা করে ঠিক সেইরূপ হইয়া পড়ে। নিজেকে 'দুর্বল পাপী' যে ভাবে, সে ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে, যে নিজেকে শক্তিমান ও পবিত্র বলিয়া নিত্য চিন্তা করে সে শক্তিমান ও পবিত্র হইয়া উঠে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

ভয় জয় করার উপায় শক্তি সাধনা। দুর্গা, কালী প্রভৃতি মূর্তি শক্তির রূপ বিশেষ। শক্তির যে কোন রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার চরণে মনের দুর্বলতা ও মলিনতা বলিস্বরূপ প্রদান করিলে মানুষ শক্তিলাভ করিতে পারে। আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, সেই শক্তির বোধন করিতে হইবে। পূজার উদ্দেশ্য মনের মধ্যে শক্তির বোধন করা। প্রত্যহ শক্তিরূপ ধ্যান করিয়া শক্তিকে প্রার্থনা করিবে এবং পঞ্চেন্দ্রিয় ও সকল রিপুকে তাঁহার চরণে নিবেদন করিবে। পঞ্চপ্রদীপ অর্থ পঞ্চেন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মায়ের পূজা হইয়া থাকে। আমাদের চক্ষু আছে তাই আমরা ধূপ, গুগ্গুল প্রভৃতি সুগন্ধি জিনিষ দিয়া পূজা করি ইত্যাদি। বলির অর্থ — রিপু বলি — কারণ ছাগই কামের রূপবিশেষ।

সাধনার উদ্দেশ্য একদিকে রিপু ধ্বংস করা অপরদিকে সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন করা। রিপুর ধ্বংস হইলেই সঙ্গে সঙ্গে দিব্যভাবের দ্বারা হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে; আর দিব্যভাব হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেই সকল দুর্বলতা পলায়ন করিবে।

প্রত্যহ (সম্ভব হইলে) দুইবেলা এইরূপ ধ্যান করিবে। কিছুদিন ধ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পাইবে, শান্তিও হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবে।

আপাততঃ স্বামী বিবেকানন্দের এই বইগুলি পড়িতে পার। তাঁহার বই-এর মধ্যে "পত্রাবলী" ও বক্তৃতাগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। 'ভারতে বিবেকানন্দ' বই-এর মধ্যে এসব বোধ হয় পাইবে। আলাদা বইও বোধ হয় পাওয়া যায়। "পত্রাবলী" ও বক্তৃতাগুলি না পড়িলে অন্যান্য বই পড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। 'Philosophy of Religion', 'Jnanyoga' বা ঐ জাতীয় বইতে আগে হস্তক্ষেপ করিও না। তারপর সঙ্গে সঙ্গে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়িতে পার। রবিবাবুর অনেক কবিতার মধ্যে খুব inspiration পাওয়া যায়। ডি. এল. রায়ের অনেক

বই আছে (যেমন 'মেবার পতন', 'দুর্গাদাস') যা পড়িলে বেশ শক্তি পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবু ও রমেশ দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও খুব শিক্ষাপ্রদ, নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'ও পড়িতে পার। 'শিখের বলিদান' (বোধ হয় শ্রীমতী কুমুদিনী বসু লিখিত) ভাল বই, Victor Hugo-র 'Les Miserables' পড়িও (বোধ হয় লাইব্রেরীতে আছে), খুব শিক্ষা পাইবে।"

[*সমগ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড* ১৮৬,১৮৭]

ঐ হরিচরণ বাগচীকেই তিনি পরের একটি চিঠিতে লিখছেন —

ধ্যান-ধারণার বিষয়ে আমি বোধ হয় পূর্ব পত্রে কিছু লিখেছি — তাই সে সম্বন্ধে এখানে আর লিখলাম না। বইগুলির নাম আমি এই পত্রে দিচ্ছি। প্রথমে যে বইগুলি সমিতির লাইব্রেরীতে পাবে তার নাম দিচ্ছি — তারপর অন্যান্য বইয়ের নাম দিচ্ছি ঃ

(ক) ধর্ম সম্বন্ধীয়

(১) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'; (২) 'ব্রহ্মচর্য' —সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য; ঐ — রমেশ চক্রবর্তী; ঐ —ফকির দে; (৩) 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ' —শরৎ চক্রবর্তী; (৪) 'পত্রাবলী' — বিবেকানন্দ; (৫) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' — বিবেকানন্দ; (৬) 'বক্তৃতাবলী' — বিবেকানন্দ; (৭) 'ভাববার কথা' — ঐ; (৮) 'ভারতের সাধনা'— স্বামী প্রজ্ঞানন্দ; (৯) 'চিকাগো (Chiago) বক্তৃতা' —স্বামী বিবেকানন্দ।

(খ) সাহিত্য, কবিতা, ইতিহাস প্রভৃতি ঃ—

(১) 'দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী'— (বসুমতী সংস্করণ); (২) 'বাঙ্গলার রূপ'— গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী; (৩) 'বঙ্কিম গ্রন্থাবলী'; (৪) নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', 'রৈবতক'ও 'পলাশীর যুদ্ধ' ; (৫) যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী; (বসুমতী সংস্করণ) (৬) রবি ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী', 'চয়নিকা', 'গীতাঞ্জলি', 'ঘরে বাইরে', 'গোরা'; (৭) ভূদেববাবুর 'সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ; (৮) ডি এল রায়ের 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন', 'রাণা প্রতাপ' (৯) 'ছত্রপতি শিবাজী' — সত্যচরণ শাস্ত্রী; (১০) 'শিখের বলিদান' — কুমুদিনী বসু ; (১১) রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল'; (১২) সত্যেন দত্তের 'কুহু ও কেকা' (কবিতা-গ্রন্থ); (১৩) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনরচিত'; (১৪) 'রাজস্থান' (বসুমতী সংস্করণ) (১৫) 'নব্য জাপান' — মন্মথ ঘোষ; (১৬) 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' —রজনীকান্ত গুপ্ত; (১৭) উপেনবাবুর নির্বাসিতের 'আত্মকথা'

ও অন্যান্য পুস্তক (১৮) 'কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস' —উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিশুপাঠ্য তিন আনা সংস্করণের ভারতের অনেক মহাপুরুষের ছোট ছোট জীবনী পাবে। এই বই-এর তালিকা যথেষ্ট। অন্ততঃপক্ষে এক বৎসরের খোরাক এর মধ্যে পাবে।" [*সমগ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৮৮*]

সুভাষচন্দ্র রচিত এই পুস্তকতালিকা থেকেই বোঝা যায় যে যুবকদের চরিত্র গঠনে তিনি ধর্মকে কতটা গুরুত্ব দিতেন, এবং যুবকদের মধ্যে দেশপ্রেম নির্মাণে শিবাজী, রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস রাঠোর, শিখদের আত্মবলিদানের কাহিনীকে তিনি কতটা অপরিহার্য বলে মনে করতেন।

আর ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের ভূমিকা সম্বন্ধে নেতাজীর ধারণা কী? তাঁর লেখা বিখ্যাত বই 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম'। ১৯৩৫ সালে লণ্ডনে বইটি প্রকাশিত হয়! কিন্তু বৃটিশ সরকার ভারতে বইটি নিষিদ্ধ করে দেয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তবেই বইটি ১৯৪৮ সালে ভারতে প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই বইয়ে তিনি লিখছেন —

"যে কোনও পর্যবেক্ষকের চোখে ভারতবর্ষ যদিও ভৌগলিক ভাবে, জাতিগতভাবে এবং ইতিহাসের বিচারে এক সীমাহীন বৈচিত্র্যের দেশ, তবু এই বৈচিত্র্যের গভীরে নিহিত রয়েছে এক মূলগত ঐক্য। মিঃ ভিনসেন্ট্ এ. স্মিথ যেমন বলেছেন ঃ ভারতবর্ষের এই ঐক্য অপেক্ষা বৈচিত্র্য সম্পর্কেই ইউরোপীয় লেখকেরা সচরাচর বেশী সচেতন ... ভারতে যে এক ধরনের প্রগাঢ় মূলগত ঐক্য গোপনে বিরাজমান, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা বা রাজনৈতিক আধিপত্য থেকে সৃষ্ট অনৈক্য অপেক্ষা তা অনেক বেশী গভীর। ভাষা, বর্ণ, শোণিত, পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ও সম্প্রদায়ের বহু বৈচিত্র্য ছাড়িয়ে এই ঐক্য পরিব্যাপ্ত। ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সত্তা বলে বোধ হয়। উত্তরে সুবিশাল হিমালয় যার সীমা নির্দেশক, অসীম সমুদ্র যার দুই দিকে রচনা করেছে বেষ্টনী, সেই ভারতবর্ষ ভৌগোলিক সত্তার একটি সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। জাতিগত বৈষম্য কখনও ভারতবর্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় নি—কেননা তার সমগ্র ইতিহাসে বিভিন্ন জাতিকে একাত্ম করে নিতে এবং তাদের মধ্যে একটি সাধারণ কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সঞ্চারিত করতে সে সমর্থ হয়েছে। এই বন্ধনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিন্দুধর্ম।

উত্তর কিংবা দক্ষিণ, পূর্ব কিংবা পশ্চিম, যেখানেই আপনি যান না কেন, এক ধর্মমত, এক সংস্কৃতি এবং একই ঐতিহ্য দেখতে পাবেন। সকল হিন্দুর চোখেই ভারতবর্ষ পবিত্রভূমি। তীর্থক্ষেত্রগুলির মতই সারা দেশে ছড়িয়ে আছে বহু পবিত্র স্রোতস্বিনী। যদি একজন ধার্মিক হিন্দু হিসাবে আপনাকে আপনার তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ করতে হয়, তাহলে দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর থেকে উত্তরে তুষারাচ্ছাদিত হিমালয়ের বুকে অবস্থিত বদ্রীনাথ পর্যন্ত আপনাকে ভ্রমণ করতে হবে।" [*সমগ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১-২*]

আধুনিক ভারতেরও আত্মসম্মান বোধের উদয় ও স্বদেশব্রতের জাগরণে হিন্দু ধর্মের ভূমিকা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র ঐ বইটিতেই (ভারতের মুক্তি সংগ্রাম) লিখেছেন —

"গত শতাব্দীর নবম দশকে দু-জন বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতা জনগণের সামনে আবির্ভূত হন, যাঁরা নবজাগরণের ভবিষ্যৎ গতিপথে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করতে ভাগ্যনির্দিষ্ট ছিলেন। তাঁরা সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। গুরু রামকৃষ্ণ গোঁড়া হিন্দুরীতিতে মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্য ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত একজন যুবক, গুরুর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাসও ছিল না, অবিশ্বাসও। রামকৃষ্ণ সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন, এবং এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের বিরোধ দূর করতে বলেন। একথাও তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে হলে ত্যাগ, সংযম ও কঠোর সাধনা প্রয়োজন। ব্রাহ্ম-সমাজের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে ধর্মীয় সাধনায় মূর্তির আবশ্যকতা তিনি সমর্থন করেছেন এবং সমাজের অতি আধুনিক অনুকরণস্পৃহার নিন্দা করেছেন। মৃত্যুর আগে, তিনি শিষ্যকে ভারতে ও ভারতের বাইরে তাঁর ধর্মোপদেশগুলির প্রচারকার্যের ভার এবং স্বদেশবাসীকে জাগিয়ে তুলবার দায়িত্ব দিয়ে যান। এই উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীদের আশ্রম রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন — যার লক্ষ্য ছিল, ভারতে ও ভারতের বাইরে, বিশেষত আমেরিকায় হিন্দু ধর্মের সত্য ও প্রকৃত রূপটির প্রচার ও তদনুযায়ী চলা। সুস্থ জাতীয় কার্যকলাপের প্রতিটি উদ্যোগকে প্রেরণা দানে স্বামীজী একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছে ধর্ম ছিল জাতীয়তাবাদের প্রেরণার উৎস-স্থল। তিনি নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতের অতীতে গর্ববোধ, ভারতের ভবিষ্যতে বিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদার চেতনা

সঞ্চারিত করার জন্যও চেষ্টা করেছিলেন। যদিও স্বামীজি কখনও কোনও রাজনৈতিক বাণী প্রচার করেন নি, তবু যে কেউ তাঁর বা তাঁর রচনাবলীর সংস্পর্শে এসেছে, তার মধ্যেই একটা দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক মনোভাব গড়ে উঠেছে। অন্তত বাঙ্গলা দেশ সম্পর্কে যত দূর বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দকে আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক স্রষ্টা বলে মনে করা যেতে পারে। ১৯০২ সালে তিনি খুব অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন, কিন্তু মৃত্যুর পর বরং তাঁর প্রভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। রামকৃষ্ণ যে সময় বাঙ্গলাদেশে বিরাজ করছিলেন, প্রায় ঠিক সেই সময়েই উত্তর-পশ্চিম ভারতে, আর একজন বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব ঘটে। তিনি আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে আর্য সমাজ আন্দোলনের সমর্থক প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে আর্য সমাজ আন্দোলনের সমর্থক ছিল সর্বাধিক। ব্রাহ্ম সমাজের মত এই সমাজ প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রগুলির দিকে ফিরে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিল। পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মে, অতিরিক্ত ও অসার যা কিছু প্রবেশ করেছিল, আর্যসমাজ সেগুলিকেও নিন্দা করে। যে জাতিভেদ-প্রথা অতি প্রাচীন কালে ছিল না, তা রহিত করার জন্য ব্রাহ্মসমাজের মত আর্যসমাজও প্রচার চালিয়েছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মত ছিল এই যে, লোককে খাঁটি আর্য-ধর্মে ফিরে যেতে হবে এবং প্রাচীন কালের আর্যদের মতন জীবন নির্বাহ করতে হবে। 'বেদে ফিরে চল' — এই ছিল তাঁর আহ্বান। ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ — উভয়েই মানুষকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু রামকৃষ্ণ এক নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন। উপরন্তু একদিকে ব্রাহ্মসমাজ যেমন পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও খৃষ্টধর্মের দ্বারা কিয়দংশ প্রভাবিত হয়েছে, অন্যদিকে আর্য সমাজের সকল প্ররণার উৎস ছিল স্বদেশ। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের কোনাটিরই রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তবু যার উপরেই তাদের প্রভাব পড়েছে, তার ভিতরেই এ ধরনের আত্ম-সম্মানবোধ ও দেশপ্রেমের প্রেরণা দ্রুত গড়ে উঠেছে।" [*সমগ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১২-১৩*]

সুভাষচন্দ্রের আরও কিছু উক্তি দেখা যাক। একটি ছাত্র সম্মেলনে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বললেন —

"হিন্দুজাতি তো গর্ব করিয়া থাকে যে, তাহারা মাতৃমূর্তির ভিতর দিয়া ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে এবং তাহারা বাল-গোপাল রূপের মধ্যে

ভগবানকে পাইয়াছে। কিন্তু আমি হিন্দুজাতিকে জিজ্ঞাসা করি, একবার বুকে হাত দিয়ে বলুন — আমাদের সমাজে বর্তমান সময়ে ঘরে এবং বাহিরে আমরা মাতৃজাতির সম্মান রক্ষা করিতে পারিতেছি কিনা — এবং আমাদের সমাজে বালক ও যুবকেরা মনুষ্যোচিত ব্যবহার পায় কিনা ?

মাতৃজাতির সম্মান যদি আমরা রক্ষা করিতে পারিতাম তাহা হইলে বাঙ্গলার জেলায় জেলায় দিনের পর দিন নারী সমাজের উপর শত লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ঘটিত না এবং ঘটিলেও আমাদের পুরুষ-সমাজ অম্লান বদনে ও নিশ্চিন্ত মনে তাহা সহ্য করিত না। আজ যদি বাঙ্গলা দেশে পুরুষ থাকিত তাহা হইলে মাতৃজাতির অসম্মান দেখিয়া তাহার ক্ষিপ্তপ্রায় হইত এবং বীরশ্রেষ্ঠ খড়্গ বাহাদুর সিংহের মত প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া মাতৃজাতির সম্মান রক্ষার্থে কর্ম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিত।

হে ছাত্রবৃন্দ, ইংরাজকে তোমরা হয়তো ঘৃণা করিয়া থাক— কিন্তু আমি বলি, ইংরাজ যেরূপ তাহার নারী জাতির সম্মান করিতে জানে, তাহা শিক্ষা কর ইংরাজের নিকট। তোমার দেশে তোমার মা ও ভগিনীর মর্যাদা রক্ষা হয় না — আর মুষ্টিমেয় ইংরাজ এই দেশে তেত্রিশ কোটি বিদেশীর মধ্যে ইংরাজ মহিলার সম্মান কি করিয়া রাখে? তাহার কারণ এই যে, একজন ইংরাজ মহিলার উপর অত্যাচার হইলে সমস্ত ইংরাজজাতি পাগলপ্রায় হয় এবং সে অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সমগ্র জাতি বদ্ধপরিকর হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মিস এলিসের পাঠান কর্তৃক অপহরণের ঘটনা হয়তো আপনাদের স্মরণ আছে।

আমরা মুখে বলি "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কি আমরা জননী ও জন্মভূমিকে ভালবাসি? জননীকে ভালবাসার অর্থ শুধু নিজের প্রসূতিকে ভালবাসা নয়, সমস্ত মাতৃজাতিকে ভালবাসা। বাঙ্গলা দেশ—বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রাণধর্ম বাঙ্গলার নারীজাতির মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি বাঙ্গলার মাতৃজাতিকে শ্রদ্ধা করিতে জানে না—সে বাঙ্গলা দেশকে কি করিয়া শ্রদ্ধা করিবে? যে ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে না — ভালবাসে না — সে কি করিয়া মানুষ হইবে? মহান আদর্শকে যে ভালবাসে না — সে পাত্রে সেই আদর্শ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে — সে পাত্রকে যে ভালবাসে না — সে ব্যক্তি কোনও দিন মানুষ হইতে পারিবে না। জীবনে

যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু কল্যাণকর — সে সবের সমাবেশ আমরা করিয়া থাকি, দেশমাতৃকার অপরূপ রূপের মধ্যে এবং ত্রিলোকজয়ী ভুবনমোহিনী মাতৃমূর্তিতে। অতএব হে ভ্রাতৃমণ্ডলী, মায়ের আরাধনা করিতে শিখ; মাতৃজাতিকে ভক্তি কর, শ্রদ্ধা কর; নিজের দেশে মাতৃজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হও।

মনে রাখিও সেই কথা — যাহা বহুযুগ পূর্বে মনু বলিয়াছিলেন,

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।।
শোচন্তি মাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বিবর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা।।

'যেখানে নারী পূজিতা হন তথায় দেবতারা আনন্দলাভ করিয়া থাকেন; যেখানে নারীর সম্মান নাই, সেদেশে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড একেবারে বিফল। যে কুলে নারীরা শোক করিয়া থাকেন (বা উৎপীড়িতা হইয়া থাকেন) সে কুল অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয় এবং যে কুলে তাহাদের কোনও দুঃখ, কষ্ট, শোক নাই সে কুলের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।' যে যুগে এ দেশে নারীজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল, সে যুগে মৈত্রেয়ী, গার্গীর মত ঋষিপত্নী জন্মিয়াছিল, সে যুগে খনা, লীলাবতীর মত বিদুষীর আবির্ভাব হইয়াছিল, অহল্যাবাঈ ও ঝান্সির রাণীর মত বীর-রমণীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। এ সোনার বাঙ্গলায়ও আমরা একদিন রাণী ভবানী, দেবী চৌধুরাণীর মত রমণী দেখিয়াছিলাম"।

[*সমগ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৫-১৭৬*]

সুভাষচন্দ্রকে কি Aggressive হিন্দু বলা যায়? তিনি তো ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান বলেই মনে করতেন। তাই তাঁর ধ্বনি ছিল 'জয় হিন্দ'। কিন্তু শুধু ভারতকে হিন্দুস্থান বলে মনে করেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। অন্য মহাদেশেও হিন্দু ধর্ম বিস্তারে তিনি আগ্রহী ছিলেন। তিনি লিখছেন —

"আফ্রিকা মহাদেশে এখন মাত্র দুইটি ধর্ম প্রচারিত হইতেছে — খ্রীষ্টীয় ও ইসলাম। সেখানে হিন্দু ধর্ম প্রচারিত হইবে না কেন ? ভগিনী নিবেদিতা বলিতেন যে হিন্দু ধর্মকে aggressive হইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দও এই ভাব প্রচার করিতেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি আমিরিকা ও ইউরোপে গিয়া ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইউরোপে অথবা আমেরিকায় ধর্মপ্রচার করিলে হিন্দু জাতির সম্বন্ধে তাহাদের ধারণার পরিবর্তন হইতে পারে—হিন্দুর দর্শন পাশ্চাত্য দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে—ভারতবাসীর গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

কিন্তু তথাকার লোকেরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিবে না। অথচ আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করিলে তাহারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে। এবং তাহারা যদি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে তবে হাজারে হাজারে গ্রহণ করিবে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে ইহাতে লাভ কি? প্রথমত সত্য প্রচারের যে লাভ, সে লাভ তো আছেই। দ্বিতীয়ত অসভ্য অথবা অর্দ্ধসভ্য আফ্রিকাবাসী হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতার আলোক পাইয়া সুসভ্য হইয়া উঠিবে। তৃতীয়ত Aggressive হওয়ার ফলে হিন্দু ধর্ম আরও শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে এবং ভিন্ন দেশে প্রচারের ফলে বাধ্য হইয়া অনেকগুলি গোঁড়ামী ও কুসংস্কার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। বিশ্বের মধ্যে ভারতের স্থান আরও উচ্চ হইবে। যদি আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে ২০০ লক্ষ হিন্দু হয় তবে নিশ্চয়ই হিন্দুজাতির এবং ভারতের প্রভাব আফ্রিকায় খুব বেশি হইবে। ভারতবর্ষকে **World Power** হইতে হইলে হিন্দুধর্ম প্রচারের ফলে অনেক সুবিধা হইবে। ইসলাম প্রধান দেশ বাদ দিলে ভারতবর্ষই এশিয়ার সর্বত্র সভ্যতা ও ধর্ম প্রচার করিয়াছে— আফ্রিকায় বা করিবে না কেন।

বর্ণ সঙ্ঘর্ষের ফলে আফ্রিকাবাসীরা ভবিষ্যতে খ্রীস্টীয় ধর্ম আর গ্রহণ করিতে চাহিবে না। খ্রীস্টীয় ধর্ম গ্রহণ করিলে লোক সাধারণত স্বজাতিদ্রোহী এবং বিজাতীয় ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এই কারণে অন্য কোনও ধর্ম না পাইলে আফ্রিকাবাসীরা বাধ্য হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবে। এই ধর্ম গ্রহণ করার ফলে তাহাদের উন্নতিও হইবে। তাহারা বিজাতীয় ভাবের দ্বারা অভিভূত হইবে না — অথচ আরও শক্তিমান ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিবে।

হিন্দুধর্ম গ্রহণের ফলে অন্য জাতির কতদূর বা কিরূপ উন্নতি হইতে পারে — ইহা কি Experiment করিবার সুন্দর বিষয় নহে?”

[*সমগ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৪-১৫*]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এই Aggressive হিন্দু নেতাজীকে নিয়েও কম্যুনিষ্ট ও সেকুলারিষ্টরা শান্তি পাবে না। নেতাজীও তাদের গলায় আটকে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। তারা না পারবে গিলতে, না পারবে ওগরাতে।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ নেতাজীর এই দেশপ্রীতি ও এই ধর্মপ্রীতিতে আন্তরিকতা সহকারেই বিশ্বাস করে। প্রকৃতপক্ষে এই দুটিই স্বয়ংসেবকদের চলার পথের পাথেয়। নেতাজী জন্ম শতবর্ষে তাঁর এই স্বদেশপ্রীতিও স্বধর্মপ্রীতি স্বদেশবাসীর মধ্যে সঞ্চারিত হোক, সংঘ এই কামনা করে এবং তার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

নেতাজী ও ডাক্তারজী

ভারত ইতিহাসের দুই যুগপুরুষ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটি বড় বিচিত্র। প্রথম সাক্ষাৎকারটি যখন ঘটে তখন দুজনের কেউই স্বমহিমায় পরিপূর্ণরূপে ফুটে ওঠেন নি। পরে তিনবার ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও দুই মহাপুরুষের মিলন হয় নি দৈবের প্রতিকূলতায়। ডাক্তারজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রথম পরিচয় ১৯২৮-এর শেষ দিকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে। তৎকালীন মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য হিসাবে ডাক্তারজী কলকাতায় এলে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং দেশের পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। বিখ্যাত বিপ্লবী বাবারাও সাভারকরও এই আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনার সময় উভয়েই উভয়ের আদর্শ ও মতবাদ নিয়ে ভাব বিনিময় করেন এবং দুজনের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই প্রীতির সম্পর্ক অটুট ছিল।

মে মাস, ১৯৩৮ সাল। তখন পুণায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অধিকারী শিক্ষণ বর্গ চলছে। সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার পুণায় সঙ্ঘ শিবিরে এসে পৌঁছালেন। এখানে কয়েকদিন থেকে ডাক্তারজী নাগপুর যাবেন। ডাক্তারজী পুণায় আসার কয়েকদিনের মধ্যেই বোম্বাই এসে পৌঁছলেন কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসে থাকলেও ডাক্তারজী ও সঙ্ঘের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। ডাক্তারজী সম্বন্ধে তাঁর মনে বরাবরই একটা উচ্চ ধারণা ছিল। সঙ্ঘের অনুশাসন, দেশের বিভিন্ন প্রদেশে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় তরুণদের সঙ্ঘকার্যে অংশগ্রহণ ও একজন দেশভক্ত বিপ্লবী নেতার প্রচারবিমুখ ও নিরলস নেতৃত্বের যে সব সংবাদ মাঝে মাঝে তিনি পেতেন তাতে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

পুণায় পৌঁছানোর পর পুণার সঙ্ঘচালক শ্রীবিনায়ক রাও আপ্টে সুভাষচন্দ্রকে একদিন অধিকারী শিক্ষণ বর্গ দেখতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কথাপ্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র জানতে পারলেন যে ডাক্তারজী তখন পুণাতেই। সঙ্ঘের

কথা তিনি বহু জায়গায় শুনেছেন, সঙ্ঘের কেন্দ্রবিন্দুকে জানার একটা আগ্রহ তাঁর ছিলই। তিনি সাগ্রহে বিনায়ক রাওয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। সঙ্ঘের অধিকারী শিক্ষণ বর্গ দেখতে আসা আর শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের হল না। কারণ? কারণটা ডাক্তারজীকে লেখা পুণার সঙ্ঘচালকের চিঠি থেকেই শোনা যাক - "........... কিন্তু মহারাষ্ট্রের সঙ্ঘদ্বেষী কর্মকর্তারা সুভাষচন্দ্রকে সাফ সাফ জানিয়ে দেন, "আপনি সঙ্ঘ ছাড়া অন্য যে কোন জায়গায় যেতে চান আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু সঙ্ঘের কোন কার্যক্রম দেখতে যাওয়া আপনার চলবে না।" সেজন্য সুভাষচন্দ্রের আর আসা হল না। বিনায়ক রাওয়ের চিঠিটি পড়ে ডাক্তারজী দুঃখিত হলেন, কিন্তু বিস্মিত হলেন না। তিনি জানতেন গত দু'তিন বছর ধরে কংগ্রেসের লোকেরা সঙ্ঘ সম্বন্ধে কি রকম অসহিষ্ণু মনোভাব পোষণ করে চলেছেন।

এর প্রায় এক বছর পরের ঘটনা। ২০শে জুন, ১৯৩৯ ডাক্তারজী পুণা থেকে নাগপুর ফিরলেন। তখন তাঁর শরীর বেশ অসুস্থ। নাগপুরের সঙ্ঘচালক শ্রীবাবাসাহেব ঘটাটে প্রস্তাব দিলেন যে, ডাক্তারজীর স্বাস্থ্য দিন প্রতিদিন যেভাবে ভেঙ্গে পড়েছে তাতে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তাঁর, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। অন্য কার্যকর্তারাও একবাক্যে এই প্রস্তাবে সায় দিলেন।

নাসিক থেকে ৮/৯ মাইল দূরে দেওলালীতে একটি বাংলো ভাড়া করা হল। নাগপুরের প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাবদাহ দেওলালীতে নেই। অনুকূল জলবায়ু। ধোণ্ডী-মার্গের পশ্চিম প্রান্তে দক্ষিণ-মুখী বাংলো। সম্মুখে খোলা মাঠের অবারিত প্রসার। বাংলোর প্রাঙ্গণে একটি জলের ফোয়ারা। পাশে ডালপালা বিস্তার করে একটি নিমগাছ। গুলমোহর গাছের আধিক্য। দূরে সবুজের প্রেক্ষাপটে লাল গুলমোহর। বর্ষার প্রারম্ভকাল, গরমের স্পর্শ নেই। বাতাস ঠাণ্ডা নির্মল। আরোগ্য-নিবাস হিসাবে আদর্শ স্থান।

ডাক্তারজীকে দেওলালীতে নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গে শ্রীগুরুজী। ২৩শে জুন নাসিক শাখা পরিদর্শনেও গেলেন। কিন্তু তার পরেই পড়লেন সাংঘাতিক অসুখে। ডবল নিমোনিয়া, ১০৩-১০৪ ডিগ্রী জ্বর। সারাক্ষণ ডাক্তারজীর সঙ্গে থেকে শ্রীগুরুজী তাঁর সেবা শুশ্রূষা করছেন। এই অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে দূত এসে হাজির। ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা জানিয়ে সুভাষচন্দ্রের বার্তা

নিয়ে এলেন শ্রী বালাজী হুদ্দার। বালাজী ডাক্তারজীর বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন এবং ১৯২৯ সালে তিনি সঙ্ঘের সরকার্যবাহ নিযুক্ত হন। পরে তিনি ইংল্যাণ্ড চলে যান এবং সেখান থেকে স্পেনে গিয়ে ফ্রাঙ্কো বিরোধী দলে যোগদান করে স্পেনের গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। সুভাষচন্দ্র বালাজীকে একলা পাঠান নি। বোম্বাইয়ের ডাঃ বসন্ত রাও রামরাও সাঁঝগিরিকেও সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের প্রতিনিধি দুজন যখন ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন ডাক্তারজীর খুবই বাড়াবাড়ি অবস্থা। তা সত্ত্বেও ডাক্তারজী ওঁদের কথা মন দিয়ে শুনলেন। ওঁদের বক্তব্য ছিল, এখন যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সুভাষচন্দ্র ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চান। আর এই ব্যাপারে তিনি ডাক্তারজীর ও সঙ্ঘের সাহায্য চান।

সমস্ত বক্তব্য শুনে ডাক্তারজী বল্লেন, এ কথা ঠিক যে সময় অনুকূল হচ্ছে, কিন্তু আপনাদের প্রস্তুতি থাকা চাই। সুভাষবাবুর পক্ষে জনবল কি রকম? নিজেদের প্রস্তুতি ব্যতিরেকে কেবল পরের ওপর ভরসা করে কাজ হবে না। ডাক্তারজীর তখন যা শরীরের অবস্থা তাতে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বেশী আলোচনা করা সম্ভব ছিল না। বালাজী ও ডাঃ সাঁঝগিরি আধ ঘন্টা আলোচনা করে চলে গেলেন। যাবার সময়ে ডাক্তারজী ডাঃ সাঁঝগিরিকে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, পরে সুবিধামত একবার নাগপুরে আসুন। তখন শান্তিতে আলোচনা করা যাবে।

এই ঘটনা সম্ভবতঃ ৮-৯ জুলাই এর, কারণ সুভাষচন্দ্র তখন বোম্বাইতে। সুভাষচন্দ্র সে সময়ে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করে ইংরাজদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সঙ্গত কারণেই সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি ধ্যেয়নিষ্ঠ, অনুশাসনবদ্ধ ও তারুণ্যে উজ্জ্বল সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কথা। কারণ যুবাবস্থা থেকেই সামরিক ধরণের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও অনুশাসনের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তা ছাড়াও সুভাষচন্দ্র ও ডাক্তারজীর মধ্যে একটা বিষয়ে খুব মিল ছিল। দুজনেই ছিলেন বিরাট সংগঠক ও মনে প্রাণে বিপ্লবী। দেশহিতই ছিল দুজনের জীবনের একমাত্র ব্রত। সুতরাং দুজনের সাক্ষাৎকার একটা ঐতিহাসিক ঘটনা হতে পারতো। কিন্তু বিধির নির্বন্ধ খণ্ডায় কে?

বালাজী ও ডাঃ সাঁঝগিরি নাসিক থেকে ফিরে যাবার চারদিন পরে ডাক্তারজী

একটা চিঠি পেলেন। চিঠির তারিখ ১২ই জুলাই, নাগপুর পৌঁছায় ১৮ই জুলাই। তাতে লেখা ছিল ঃ- আমরা যে কাজের জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম তার পেছনে আমাদের কী প্রবল আগ্রহ ছিল বুঝতেই পারছেন। আপনি নাগপুর যাওয়ার জন্য যে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু কতগুলি অনিবার্য কারণে আপাততঃ নাগপুর যাওয়ার ইচ্ছা মুলতুবী রাখতে হচ্ছে। আপনি ২০শে জুলাই একবার বোম্বাই আসতে পারবেন কি? আপনার সঙ্গে এখানে একবার সাক্ষাৎকারে আমাদের প্রবল ইচ্ছা। আশাকরি আপনি আমাদের নিরাশ করবেন না। সম্পর্কিত ব্যক্তি ২০ তারিখ রাত্রে এখান থেকে চলে যাবেন। অন্ততঃ এক দিনের জন্যও আসুন। সকলের পক্ষে মঙ্গলকর কোন পরিকল্পনা আমরা নিশ্চয়ই রচনা করতে পারবো।" সম্পর্কিত ব্যক্তিটি যে সুভাষচন্দ্র সে কথা বলাই বাহুল্য।

এর পরের ঘটনাও আবার প্রায় এক বছর পরের। ডাক্তারজী তখন নাগপুরে। তাঁর শরীর কিছুতেই সারছেনা। একবার একটু ভাল হন তো পরেই আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারজীকে রাখা হয়েছে বাবাসাহেব ঘটাটেজীর বাংলোয়। ১৯ শে জুন ১৯৪০-র রাত্রি খুবই উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে। সারারাত ডাক্তারজী এক দণ্ডও ঘুমোতে পারেন নি। পরের দিন বৃহস্পতিবার সকালের দিকে সবেমাত্র একটু নিদ্রাভাব এসেছে এমন সময় বাবাসাহেবের বাংলোর সামনে একটি গাড়ি এসে দাঁড়ালো। গাড়ীর মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীরামভাউ রুইকর। ফরোয়ার্ড ব্লকের অধিবেশনের জন্য সুভাষচন্দ্র নাগপুর আসেন ১৮ই জুন। ডাক্তারজীর অসুস্থতার কথা শুনেই তিনি ডাক্তারজীকে দেখতে আসেন। ডাক্তারজীর শয্যাপাশে তখন শ্রীকৃষ্ণ পুরাণিক ও শ্রীযাদবরাও যোশী বসে। সুভাষচন্দ্র ঘরে ঢুকে ডাক্তারজীর জ্বর দেখলেন ও তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। যাদবরাও জানালেন, দশ-পনেরো দিন ধরে জ্বর কিছুতেই ১০৩-১০৪ ডিগ্রী-এর নীচে নামছে না। রাতের পর রাত একদম ঘুম নেই। এইমাত্র দুটি চোখের পাতা এক হয়েছে। তাঁরা সুভাষচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি বিশেষ জরুরী কিছু আছে, তাহলে ওঁকে ডেকে দিই। সুভাষচন্দ্র বললেন, আসলে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারে এসেছিলাম। উনি অসুস্থ শুনে এখন ওঁকে একবার দেখতে এলাম। যাই হোক ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আবার পরে আসবো। এর পর সুভাষচন্দ্র ডাক্তারজীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে শুধু হাত জোড় করে ডাক্তারজীর

উদ্দেশ্যে নমস্কার জানান। তারপর বাইরের ঘরে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে গাড়ীতে গিয়ে ওঠেন। সুভাষচন্দ্রের গাড়ী ঘটাটেজীর বাংলোর সীমা পার হতে না হতেই ডাক্তারজীর নিদ্রাভঙ্গ হল। উনি কি বললেন, নিতান্ত উৎসুক হয়ে ডাক্তারজী জিজ্ঞাসা করলে যাদবরাও বললেন, উনি আপনাকে দেখে গেলেন। পরে আবার দেখা করতে আসবেন বলে গেলেন। সামান্য কয়েক মুহূর্তের হেরফের - সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল না বলে ডাক্তারজীর খুব খারাপ লাগলো। একটু গম্ভীর হয়ে থেকে ডাক্তারজী দুই হাত জোড় করে সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানালেন। দৈবের কী লীলা! তিনবার সবরকমের চেষ্টা সত্ত্বেও দুই যুগপুরুষের সাক্ষাৎ হল না এবং হবার সম্ভাবনাও আর রইল না।

কারণ, পরের দিন শুক্রবার ২১ শে জুন, ১৯৪০ ডাক্তারজী মহাপ্রয়াণ করলেন।

[সূত্র ঃ— *"ডাক্তার হেডগেওয়ার চরিত্র" — নানা পালকর*]

✡ ✡ ✡

সঙ্কলক ঃ তপন কুমার ঘোষ

প্রকাশক ঃ তুহিনা প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ২৯শে জানুয়ারী-১৯৯৭

তৃতীয় সংস্করণ ঃ নভেম্বর-২০১৪

মুদ্রক ঃ মহামায়া প্রেস এ্যান্ড বাইন্ডিং

মূল্য ঃ ৬.০০ টাকা

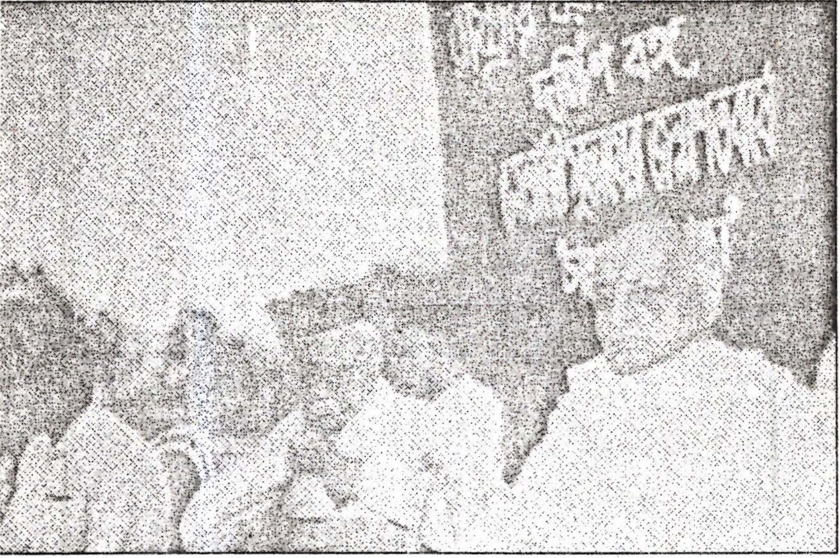

মঞ্চে মাননীয় শ্রী শেষাদ্রিজী, শ্রদ্ধেয় নীরারেন্দু দত্তমজুমদার, জ্যোতির্ময় চক্রবর্ত্তী, সত্যনারায়ণ মজুমদার

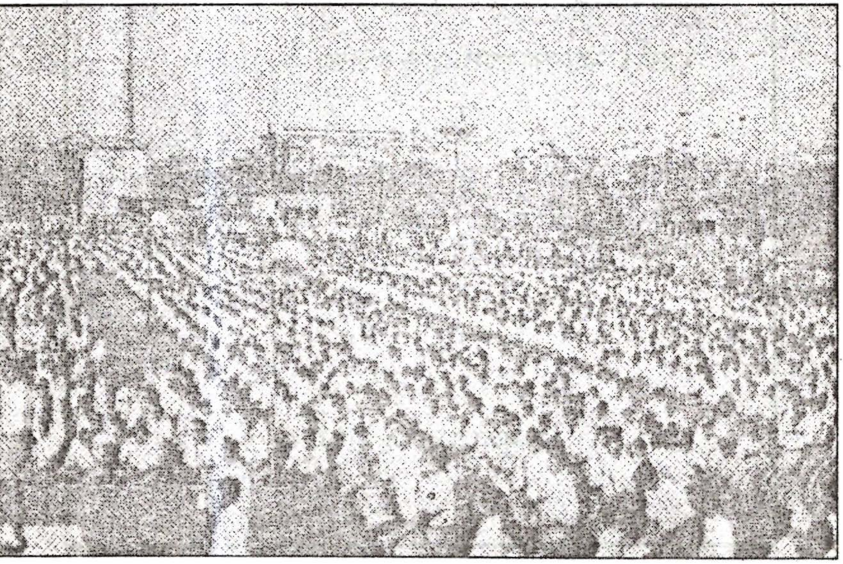

সমাবেশের একাংশ